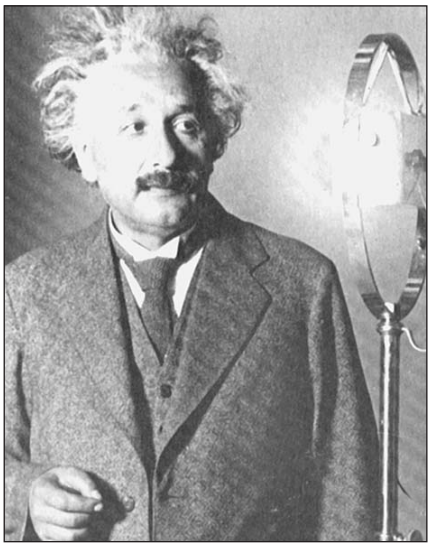

AvjevU AvBb÷vB‡bi mvov †djv Av‡cw¶K Z‡Ëi 100 eQi D`hvcb Kiv Dcj‡¶¨ 2005 mvj‡K Ôc`v_ weÁv‡bi eQiÕ wn‡m‡e †NvlYv Kiv n‡q‡Q| c`v_ weÁv‡bi GB AmvaviY ARb wb‡q wj‡L‡Qb **আসিফ**

আইনস্টাইন আপেক্ষিক তত্ত্বের ১০০ বছর

উনবিংশ শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকে যদি আমরা কেউ মনোরম তুসকান গ্রামাঞ্চল দিয়ে হাটতাম তাহলে হয়তো দেখা হয়ে যেত ইতালীর প্যাভিয়ার দিকে চলে যাওয়া রাস্তায় হাইস্কুল থেকে বহিস্কৃত একটু লম্বা চুলের ১৬ বছরের একটি ছেলের সাথে। জার্মানিতে তাঁর শিক্ষক তাকে বলেছিল যে তাঁর কোনো কিছু হবার যোগ্যতা নেই, তাঁর প্রশ্ন ক্লাসরুমের শৃংখলা নষ্ট করছে, তাঁর স্কুল থেকে বের হয়ে যাওয়াটা মঙ্গলজনক। সূতরাং সে বের হয়ে পড়লো, এবং আনন্দে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগলো উত্তর ইতালীতে। এই সময় সে গভীরভাবে যা চিন্তা করতো তা তার অতিরিক্ত শৃংখলাপূর্ণ প্রুশিয়ান স্কুলরুমে জোর করে পড়ানো বিষয়গুলো হতে অনেক দূরের। এই এই স্কুল খেদানো বালকটির নাম ছিল আলবার্ট আইনস্টাইন, যার চিন্তা জগতকে পরিবর্তিত করে দিয়েছিল। কোনো নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে তিনি বছরের পর বছর গভীরভাবে চিন্তা করে যেতে পারতেন। প্রায়ই প্যাটেন্ট অফিসে কেরানির চাকুরী থেকে ফেরার পথে রাস্তায় অনেকক্ষণ ধরে হেঁটে বেড়াতেন আর তাঁর চিন্তাগুলো ধীরে ধীরে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যেতেন। হঠাৎ করেই তিনি স্থান, কালের ভিত্তি নিয়ে প্রশ্ন করা শুরু করেন। তাঁর এই অসাধারণ চিন্তাধারা ১৯০৫ সালে এনালেন ডার ফিজিকে তিনটি প্রবন্ধের আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। শৈশবে সংগীতের প্রতি আইনস্টাইনের প্রচণ্ড আগ্রহ দেখে তাঁর মা তাঁকে একটি বেহালা কিনে দেন, যেটি তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত শয্যাপাশে রাখেন। আইনস্টাইন বলেছিলেন, 'ছয় বছর বয়সে আমি হাতে বেহালা তুলে নেই। চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত একটানা বেহালা বাজানোর শিক্ষা চলে। তবে জীবনে প্রথম যেদিন মোজার্টের সোনাটা যথার্থ বুঝলাম, খুব ভাল লেগে গেল মোজার্ট। দেখলাম, শিক্ষক যা শিখাতে এতদিন এত চেষ্টা করছেন এখন তা আমি অনায়াসে আয়ত্ব করতে পেরেছি। তখনই উপলব্ধি করলাম কর্তব্যপরায়ণতা নয়, ভালবাসাই হলো সবচেয়ে বড় শিক্ষক'।

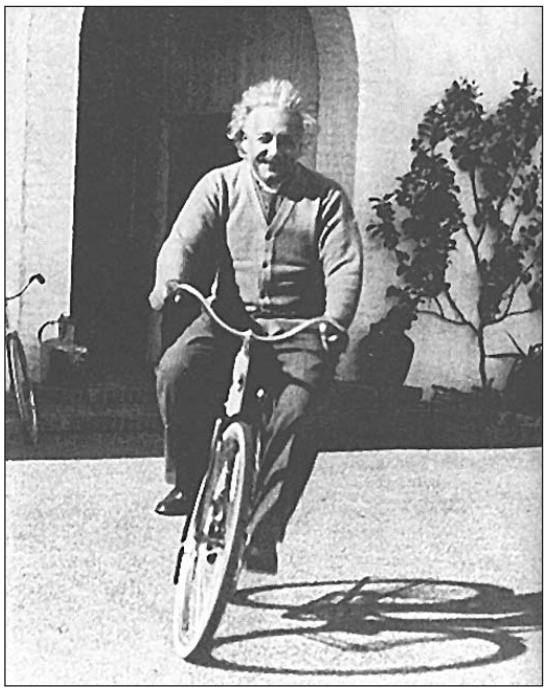

শৈশবের দিনগুলো

আইনস্টাইনের জন্ম ১৮৭৯ সালের ১৪ মার্চ, জার্মেনির উলম্ শহরে। বাবার নাম ছিল হেরম্যান আইনস্টাইন এবং মায়ের নাম পলিন আইনস্টাইন। তাঁর বাবা ছোট একটি রাসায়নিক কারখানার কর্মচারী ছিলেন। বলতে গেলে বাবা হেরম্যানই বিজ্ঞানের ক্ষমতা সম্পর্কে তাঁকে প্রাথমিক ধারণা দিয়েছিলেন। আইনস্টাইনের এক বছর বয়সের সময় তাঁর পরিবারে দেখা দিল চরম অর্থনৈতিক দুর্দশা। ফলে তাঁদের বাধ্য হয়ে মিউনিখের শহরতলীতে চলে যেতে হয়। আইনস্টাইন স্কুলের পড়াশুনায় মোটেও মনযোগী ছিলেন না। শিক্ষকরা বলতেন 'ছেলেটি একেবারে বোকা'। তিনি মিউনিখের বাগানঘেরা বাড়ীতে একা একা ঘুরে বেড়াতেন এবং আপন মনে ভাবতেন। বাবা-মা তাঁকে নিয়ে খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন। তবে মা তার এ গাম্ভির্য সম্পর্কে বলতেন, 'আমার ছেলে বড়ো হয়ে অধ্যাপক হবে'। চাচা রাডি একথা শুনে হাসতেন আর মনে মনে বলতেন 'কেবল ভাল ছাত্ররাই অধ্যাপক হবার যোগ্যতা রাখে'। কিন্তু ইতিহাস মায়ের অনুভবকে সত্য প্রমাণ করেছিল।

শৈশব থেকে আইনস্টাইন ছিলেন একগুয়ে ও চুপচাপ স্বভাবের, তিন বছর বয়স পর্যন্ত কথাই বলতেন না। আইনস্টাইনের ৫ বছর বয়সে বাবা তাকে একটি কম্পাস কিনে দিয়েছিলেন। যে কম্পাসের কার্যাবলী তাঁর শিশুমনকে ভীষণভাবে আলোড়িত করেছিল। তিনি ১২ বছর বয়সে একবার ইউক্লিডের সমতল জ্যামিতির উপর একটি বই পেয়েছিলেন। বইটি তাকে এতটা আকর্ষণ করেছিল যে, তিনি

সারারাত জেগে বইটির সমস্ত প্রশ্নমালার সমাধান করে ফেলেন। তিনি ইউক্লিডের এলিমেন্ট গ্রন্থ সম্পর্কে বলেছেন, 'যৌবনে যিনি এই বই পড়ে অনুপ্রাণিত হননি তিনি তত্ত্ব চর্চার জন্য জন্মগ্রহন করেন নি।' তিনি পৃথিবীর সমস্ত রহস্যের সমাধান নিজেই করতে চাইতেন। স্কুল জীবনে তিনি মোটেই ভালো ছাত্র ছিলেন না। একাডেমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা তাঁকে রীতিমতো বিতশ্রদ্ধ করে তুলেছিল, তিনি এ নিয়ে ঘৃণা-পোষণ করতেন। তিনি বহু কষ্টে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষা শেষ করেন। তিনি বলতেন 'যে শিক্ষা মানুষকে মুক্তভাবে চিন্তা করতে শেখায় না, মুক্ত চিন্তার প্রেরণা যোগায় না তা মানুষের মানসিক বিকাশের পরিপন্থি (অবশ্য আমাদের বর্তমান অবস্থা দেখলে তিনি সবকিছুকে বিসর্জন দিতেন)।' একবার তিনি বলেছিলেন, 'কখনো কখনো কেউ কেউ তরুণ প্রজন্মের কাছে সর্বাধিক জ্ঞান পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যম হিসেবে স্কুলকে গণ্য করেন। কিন্তু তা ঠিক নয়। স্কুলের উচিত তরুণদের মধ্যে সেইসব গুণ ও দক্ষতা গড়ে তোলা, যা মানবজাতির কল্যাণের জন্য মূল্যবান'।

তত্ত্বের জগতে আইনস্টাইন অভিভূত হয়েছিলেন বার্নস্টাইনের লেখা জনপ্রিয় বিজ্ঞানের বইটি (People's Book Of Natural Science) পড়ে। এই বইয়ের প্রথম দিকের পৃষ্ঠাগুলোতে লেখা ছিল তারের মধ্যেদিয়ে বিদ্যুতের বিস্ময়কর গতি ও মহাশূন্যের ভিতর আলোর গতি সম্পর্কে। এরপর আইনস্টাইন ষোল বছর বয়সে কতোগুলো মানস-পরীক্ষা (thought experiment) করেন। অনেকে মনে করেন, ১৯০৫ সালে তিনি যে বিশেষ আপেক্ষিকতত্ত্ব আবিষ্কার করেন তা তার এই মানস পরীক্ষার ফলশ্রুতি। আইনস্টাইনের মানস পরীক্ষাটা ছিল এরকম: 'মনে করুন কোনো ব্যক্তি যদি আলোর গতিতে ধাবমান হয়, তাহলে তার কাছে বিভিন্ন বস্তু কেমন দেখাবে? কোনো ব্যক্তি যদি আলোর তরঙ্গে সওয়ার হয়ে আলোক তরঙ্গ বরাবর চলে তাহলে আলোক তরঙ্গ তার কাছে কীভাবে আবির্ভূত হবে? আলোক তরঙ্গে আরোহী ব্যক্তি যদি তার সামনে একটি দর্পন ধরে রাখে, তাহলে আরোহীর ছায়া কি ঐ দর্পনে পড়বে?' এইসব প্রশ্ন থেকে নানা ধরনের প্যারাডক্সের বা স্ব-বিরোধ সৃষ্টি হল যা সমাধানের জন্য কিছু প্রস্তাবনা আসলো কিন্তু তা টিকলো না। এইসব সমস্যা থেকে একটি সহজ প্রশ্ন তিনি তুলে আনলেন- 'আসলে দুটি ঘটনার যুগপত্ততা বলতে আমরা কী বুঝি?'

দৈনন্দিন জীবনে আলোর গতিবেগ আমাদের কাছে প্রায় অসীম এবং সেইজন্য যুগপত্তির ধারণা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না। দুটো ঘটনা একই জায়গায় একই সংগে ঘটলে আমরা বলি ঘটনা দুটো যুগপৎ ঘটেছে। কিন্তু আর একটু অন্যভাবে যুগপত্তির সংজ্ঞা দেওয়া যায়: ধরা যাক খারাপ আবহাওয়ার দরুন রেললাইনে দুটো বজ্রের পতন হল, বজ্রপতনের ফলে ভুমির উপর চিরস্থায়ী ক্ষতের সৃষ্টি হল। এখন ওই দুটো ঘটনার মাঝামাঝি ভূমিতে অবস্থিত কোনো পর্যবেক্ষকের কাছে ঘটনা দুটো একই সঙ্গে ঘটেছে বলে মনে হবে। অর্থাৎ ঘটনা দুটি সমকালীন। আবার মনে করি, ঐ সময়ে ঐ মধ্যবিন্দু অতিক্রম করে কোনো পর্যবেক্ষক ট্রেনে করে কোথাও যাচ্ছে। তার কাছে কি ঘটনা দুটি সমকালীন মনে হবে? ধরা যাক ট্রেনটি বামদিক হতে ডানদিকে সমবেগে চলছে। বজ্রপতনকালে ট্রেনের পর্যবেক্ষক এবং স্থির পর্যবেক্ষক একই জায়গায় ছিল, কিন্তু ঐ বিন্দুতে আলো এসে পৌঁছাতে পৌঁছাতে ট্রেনের পর্যবেক্ষক আরও কিছু দূর এগিয়ে যাবে। ফলে যে বজ্রটি সামনের বিন্দুতে পড়েছে সেটা সে আগে দেখবে এবং পিছনেরটা পরে দেখবে। অর্থাৎ এই ঘটনা দুটো যুগপৎ মনে হবে না। ফলে একজন দর্শক ঘটনা দুটো একসাথে দেখছে আর একজন ঘটনা দুটো আগে-পরে দেখছে।

পরস্পরের সাপেক্ষে সমবেগে গতিশীল কাঠামোগুলোকে জড় কাঠামো বলে। এখানে রেলপথ ও ট্রেন পরস্পর সাপেক্ষে সমবেগে গতিশীল। অতএব তারা জড় কাঠামো। রেলপথের যে-দুই বিন্দুতে বজ্রপাত ঘটেছিল সেখান থেকে বেতার তরঙ্গের মাধ্যমে যদি সেখানকার দুটো ঘড়ির সময় সংকেতও পাঠানো হত তাহলে মাঝখানে দর্শক একই সময় তাদের ঘটনাবলী ঘটেছে বুঝতে পারতো। কিন্তু ঐ সময় সংকেত ট্রেনের পর্যবেক্ষক তার নিজের মাপনীতে

মহাবিশ্বের প্রসারণ

সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্বের সবচেয়ে বড় বিজয়ের একটি হলো মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়া। এর আগে কোনো তত্ত্ব আমাদের এতটা যুক্তিগ্রাহ্য এবং শৃঙ্খলাপূর্ণ ধারণা দিতে পারেনি। মহাকর্ষসূত্রের আলোকে নিউটন মহাবিশ্ব সম্পর্কে ধারণা দিয়েছিলেন যে, সমস্ত নক্ষত্র ও গ্যালাক্সিসমূহ বিশ্বে কেন্দ্রীভূত অবস্থায় রয়েছে এবং তার চারিদিকে শুধু বস্তু বিহীন মহাশুন্য বিদ্যমান। স্থানের অসীম সাগরে আমাদের বিশ্ব যেন কতোগুলোর দ্বীপমালার সমষ্টি। অনেকেই শুধুমাত্র যুক্তির নিরিখে ধারণাটি গ্রহন করতে পারেনি। এছাড়াও নক্ষত্র ও গ্যালাক্সির বাইরে বস্তুবিহীন বিশ্বের গঠন প্রকৃতি সম্পর্কেও এ তত্ত্ব কিছু বলে না। আইনস্টাইন অবশ্য বলেছেন এ তত্ত্ব যাই বলুক না কেন এটা গাণিতিকভাবে অসন্তোষজনক। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে মহাবিশ্ব সৃষ্টি সংক্রান্ত চিন্তাভাবনার দ্বার খুলে যায় সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্বের মাধ্যমে। বিশ্ব সৃষ্টি তথা বিশ্বের গঠন প্রকৃতি নিয়ে পদার্থবিজ্ঞানে আলোচনা সম্ভব তা সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্বই প্রমাণ করেছে। এই তত্ত্ব আইনস্টাইন ১৯১৬ সালে প্রকাশ করেছিলেন। দর্শকের পক্ষে স্থানীয়ভাবে মহাকর্ষ ও জড়জ্বণিত ত্বরণের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় সম্ভব নয় সংক্রান্ত সমতুল্যতা ও সমভেদিতার নীতি, আলোর গতির ধ্রুব আচরণসহ অ-ইউক্লিডীয় জ্যামিতি ও টেন্সর ক্যালকুলাসের গাণিতিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে এ তত্ত্ব গড়ে তুলেছিলেন। আইনস্টাইন মহাবিশ্বকে বর্ণনার জন্য দুটো নীতি ধরে নিয়েছিলেন তাহলো (১) সমস্ত স্থানে পদার্থের একটি গড় ঘনত্ব বিদ্যমান বা সর্বত্র সমান এবং কোথাও শুন্য নয়। এই নীতি অনুসারে মহাবিশ্বের যে কোনো দিকে যে-কোন জায়গা মোটামুটি একই ধরনের। (২) স্থানের আয়তন সময় নিরেপেক্ষ। সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্বের ভিত্তিতে এই স্বীকার্য বা অনুমানগুলো নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু এজন্য ক্ষেত্র সমীকরণে একটি ধ্রুবক যোগ করতে হয়েছিল এবং একে মহাবিশ্ব ধ্রুবক বলেছিলেন। যদিও তিনি বলেছেন যে এই ধ্রুবকটিকে তত্ত্বটির নিজস্ব প্রয়োজনে এটা যোগ করতে হয়নি এবং তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে একে স্বাভাবিক বলে মনে হয়নি। এ প্রসঙ্গে আইনস্টাইন বলেছেন, 'আমার কাছে দ্বিতীয় স্বীকার্য অর্থাৎ 'স্থানের আয়তনের সময় নিরেপেক্ষতা, অপরিহার্য মনে হয়েছিল। এই স্বীকার্যটি গ্রহন না করলে পরিস্থিতি খুব জটিল হয়ে যাবে, অসম্ভব সব কল্পনার আশ্রয় নিতে হবে'। তিনি আসলে নির্দিষ্ট আয়তন আছে কিন্তু সীমাহিন এক মহাবিশ্বের কল্পনা করেছিলেন। এই জগতের একটি নির্দিষ্ট ব্যাসার্ধ আছে যা সময়ের সাথে পরিবর্তনীয় নয়। এই বিশ্বের প্রত্যেকটি বিন্দুই এর কেন্দ্র অথবা এর প্রান্ত হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

কিন্তু আইনস্টাইন এ ধরনের একটি বিশ্ব কল্পনা করতে গিয়ে তিনি তার সমীকরণে এমন একটি ধ্রুবক ধরে নিয়েছিলেন যা সমীকরণে ঠিক স্বাভাবিক ছিল না। এই মহাবিশ্ব ধ্রুবক ধরার পিছনে মুল কারণটি ছিল মহাবিশ্বকে সুস্থির বা স্থিতিশীল হিসেবে বিবেচনা করার জন্য। এর মাধ্যমে তিনি একটি মহাকর্ষ-বিরোধি বল (anti gravity) এমনভাবে বিবেচনা করেছিলেন যা

মহাকর্ষ বলের কারণে স্থান-কালের সংকোচনের বিরুদ্ধে কাজ করতে পারে। এরফলে বিশ্ব সংকোচিত না হয়ে এই দুই বলের প্রতিক্রিয়ায় একটি নিখুত ভারসাম্য তৈরি করতে পারে। ফলে মহাবিশ্বকে সুস্থির হিসেবে কল্পনা করা যায় এবং জগত ব্যাসার্ধ স্থির অর্থাৎ সময় নিরেপেক্ষ থাকে। পরিস্থিতিকে এভাবে বর্ণনা করা যায় যে তত্ত্বের স্বাভাবিক প্রবণতাকে রোধ করে পূর্বের গড়ে ওঠা বিশ্বাসকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছিল তখন। আর সেইসময় রুশ গণিতবিদ ও পদার্থবিজ্ঞানী আলেক্সান্দার ফ্রিডম্যান দেখালেন আমরা ঐ ধ্রুবকটিকে না ধরেই সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্বের স্বাভাবিক প্রবণতা অনুসারে একে ব্যাখ্যা করতে পারি। তিনি দেখালেন দ্বিতীয় স্বীকার্যকে বাদ দিলে মহাকর্ষক্ষেত্র-সমীকরণগুলোর এমন একটি সমাধান বের করা সম্ভব যাতে দেখানো যায় এই মহাবিশ্বের ব্যাসার্ধ অর্থাৎ জগত ব্যাসার্ধ সময়ের উপর নির্ভরশীল-- যা বিশ্ব প্রসারণের দাবী করছে।

আইনস্টাইনের মহাবিশ্ব তত্ত্বে সময়ের সাথে বিশ্বের আয়তনের কোনো সম্পর্ক ছিল না কিন্তু ফ্রিডম্যান দেখালেন যে সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্বের স্বাভাবিক প্রবণতাকে গ্রহন করলে এ ধারণা এমনিই চলে আসে। ফলে প্রসারণশীল মহাবিশ্বের ধারণা আমাদের মানসপটে ক্রমশ দৃঢ় করে চলেছি। ১৯৭০ সালে রজার পেনরোজ ও স্টিফেন হকিং গণিতের মাধ্যমে দেখালেন যে মহাবিশ্ব যদি পদার্থ ও শক্তি দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বকে সঠিক বলে নেই তাহলে আদিতে বিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে কোনো এক ব্যাতিক্রমী বিন্দু থেকে। এই উপপাদ্যটির নাম সিঙ্গুলারিটি উপপাদ্য বা Singularity Theorem বলে।

এই ধরনের একটি সিদ্ধান্তে আসার জন্য ফ্রিডম্যান ১৯২২সালে দুটো স্বীকার্য বা নীতিমালা নিয়েছিলেন সেগুলোর একটি হলো আমরা যেদিকে তাকাই না কেন মহাবিশ্বের রূপ একইরকম দেখাবে এবং দ্বিতীয়টি হলো আমরা যদি মহাবিশ্বকে অন্যকোনো জায়গা থেকে পর্যবেক্ষণ করি তাহলেও মহাবিশ্বকে একইরকম দেখাবে। এবং এগুলি থেকে তিনি দেখালেন আমাদের মহাবিশ্ব ক্রমাগত প্রসারিত হচ্ছে। ১৯২৯ সালে জ্যোতির্বিজ্ঞানী হাবলের আবিষ্কার থেকে জানা গেল গ্যালাক্সিগুলো পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে আর এই দূরে সরে যাওয়ার হার দূরত্বের সমানুপাতিক। এইভাবে প্রমাণিত হলো বিশ্ব প্রসারণশীল।

গ্যালাক্সিগুলো বা নক্ষত্রপুঞ্জ যে সরে যায় তা একমাত্র ডপলারের নীতির মাধ্যমে বোঝা সম্ভব এবং যেহেতু ফ্রিডম্যানের হিসাব মতে মহাকর্ষের ক্ষেত্র-সমীকরণ অনুসারে এই ঘটনা ঘটে থাকে। অতএব হাবলের আবিষ্কারকে তাই সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্বের প্রমাণ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। আপেক্ষিকতত্ত্বের ভিত্তিতে ফ্রিডম্যানের মডেল বলে সমস্ত গ্যালাক্সিগুলো পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে অনেকটা বেলুন ফোলানোর মতো। বেলুনের কয়েকটি বিন্দু রং দিয়ে চিহ্নিত করা থাকলে বেলুনটা ফোলানোর সঙ্গে সঙ্গে রং করা বিন্দুগুলোর মধ্যে অন্তর্বর্তী দূরত্ব বাড়বে কিন্তু কোনো বিন্দুকে প্রসারণের কেন্দ্র বলা যাবে না। আবার প্রত্যেকটা বিন্দুকে প্রসারণের কেন্দ্র বলা যাবে। ১৯২৭ সালে বেলজীয় পদার্থবিজ্ঞানী জি.ই.লেমাইটার প্রথম প্রস্তাব করেন সৃষ্টির শুরুতে বিশ্বের বস্তু ও শক্তি সবই একটি বিশাল ভরে কেন্দ্রীভূত ছিল। ওই কেন্দ্রীভূত ভরকে মহাজাগতিক ডিম বলেছেন। এছাড়াও ফ্রিডম্যান গবেষণার উপর ভিত্তি করে রবার্টসন-ওয়াকার পরবর্তীতে জর্জ গ্যামো, ডি সিয়ামা, অ্যালান গাথ বলেন সুদূর অতীতে গ্যালাক্সি, নক্ষত্রসহ সমস্ত বস্তু ও শক্তি একত্রে একটি অসীম ঘনত্বের বিন্দুতে নিহীত ছিল। আজ থেকে প্রায় ১৫শত কোটি বছর আগে ঐ বিন্দুটির সর্বকালের সর্ববৃহত বিস্ফোরণে মহাবিশ্বের সূচনা হয়। তারই ফলাফল হিসেবে মহাবিশ্ব এখনও প্রসারিত হচ্ছে। এই বিস্ফোরণকে মহাবিস্ফোরণ বা Big Bang বলে। এই মহাবিস্ফোরণের সাক্ষ্য হিসেবে back ground radiation পশ্চাদপট আকারে 3°k তাপমাত্রা পাওয়া যাচ্ছে।

ভিন্ন ভিন্ন সময় পেত। আলোর গতি থেকে বেশি গতিতে কোনো কিছুই চলতে পারেনা। এই সমস্ত ঘটনাবলী থেকে আইনস্টাইন যা বললেন তা হলো, প্রত্যেক জড় কাঠামোর নিজস্ব বিশেষ সময় প্রবাহ রয়েছে। সময়ের বর্ণনায় যদি ঘটনার সাথে জড় প্রসঙ্গ কাঠামোর কোনো উল্লেখ না থাকে তাহলে সে বর্ণনার কোনো অর্থ দাঁড়াবে না। ফলে পরম সময় প্রবাহ বলে কিছু থাকে না। 'মহাশুন্যে দুটি নক্ষত্রের বিস্ফোরণ একসাথে ঘটেছে' কথাটার কোনো মানে দাঁড়াবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা কোথা থেকে ঘটনাটি দেখছি তা উল্লেখ না করছি। এই সৌরজগৎ থেকে না দেখে অন্য কোনো নক্ষত্রের কোনো গ্রহ থেকে দেখলে ঘটনাটি একসাথে নাও ঘটতে পারে। আলোর গতির প্রচণ্ডতার কারণে দৈনন্দিন জীবনে এ-ধরনের ঘটনাবলীকে আমরা অনুভব করি না।

Lorentz transformation

$$x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

$$y' = y$$

$$z' = z$$

$$t' = \frac{t - \frac{vx}{c^2}}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

সময় সম্পর্কে আমাদের যে চিরায়ত ধারণা জন্ম নিয়েছিল তাহলো সময়ের একটি নিরপেক্ষ সত্ত্বা রয়েছে অর্থাৎ জড় কাঠামোর গতির সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। যুগপত্তির এই আপেক্ষিকতা আমাদের সময় সম্পর্কে ধারণা বদলে দিয়েছে এবং স্থান ও কালকে একই পর্যায়ভুক্ত করে চতুর্মাত্রিক বিশ্বে আমাদের অভিজ্ঞতা সম্প্রসারিত করেছে।

১৯০৫ সালে প্রকাশিত তিনটি গবেষণাপত্র

ভালো ছাত্র না হওয়ার কারণে স্কুল ত্যাগ করে ইতালিতে মা-বাবার কাছে চলে যেতে হয়েছিল জুরিখে পড়াশোনার আশায়। বহু কষ্টে ১৯০০ সালে তিনি সুইস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি থেকে গণিতে ডিপ্লোমাসহ গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি লাভ করেন। এই আইনস্টাইনকে চাকুররির জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হয়েছে। শিক্ষকদের সাথে সুসম্পর্ক না থাকার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরি জাটে নি। ১৯০১ সালে আইনস্টাইনের প্রথম গবেষণাপত্র প্রভাবশালী পত্রিকা এনালেনডার ফিজিকে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু তারপরও জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয় পি. এইচ. ডি র জন্য তা যথেষ্ট নয় বলে বাতিল করে দেয়। তিনি গবেষণাপত্রটির একটি অনুলিপি ভিল্ডহেম অস্টওয়াল্ডের কাছে পাঠান (যিনি পরবর্তীতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন) যার রসায়নশাস্ত্রের বই পড়ে আইনস্টাইন অনুপ্রাণিত বোধ করেছিলেন। কিন্তু কোনো উত্তর আসেনি। এরপর তিনি লাইডেনের অধ্যাপক কামেলিং ওনসের কাছে একই অনুরোধ করে চিঠি দেন তাতেও কোন উত্তর আসে না। এই সময় তাঁর ব্যর্থ ব্যাবসায়ী, অসুস্থ এবং শিক্ষিত সমাজের বহিরাগত বাবা তাঁকে না জানিয়ে চিঠি লেখেন অস্টওয়াল্ডের কাছে। তিনি লিখেছেন, 'পিতা তার সন্তানের স্বার্থে লিখছে বলে ক্ষমা করবেন; আমার পুত্র আইনস্টাইনের বয়স ২২ বছর, যারা তাঁর বিচার করতে পারেন তাঁরা প্রত্যেকে তাঁর প্রতিভার প্রশংসা করে। তাঁর বেকার অবস্থার জন্য সে গভীরভাবে অসুখী...আপনি তাঁর প্রবন্ধটি পড়বেন এবং তাঁকে উৎসাহ দিয়ে কয়েক লাইন লিখবেন যাতে আবার সে তাঁর জীবনে এবং তাঁর কাজে আনন্দ ফিরে পায়।' কিন্তু তারপরও কোনো উত্তর আসেনি।

১৯০২ সালে বন্ধু মার্সেল গ্রসের বাবার সহায়তায় সুইস প্যাটেন্ট অফিসে 'তৃতীয় শ্রেণীর টেকনিক্যাল এক্সপার্ট' হিসেবে চাকুরি পেয়েছিলেন। আইনস্টাইন এ চাকুরির ফলেই সম্ভব হয়েছিল তাঁর সহপাঠিনী মিলেভার সাথে বিয়ে। এখানে উপযুক্ত গ্রন্থাগার থেকে দূরে, চাকুরীর মুল্যবান সময় চুরি করে তিনি ১৯০৫ সালে এনালেন ডার ফিজিকে প্রকাশিত অসাধারণ তিনটি প্রবন্ধ লেখেন যা পৃথিবীর জ্ঞান বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক নতুন বাঁক তৈরি করে। প্রবন্ধ তিনটির প্রথমটি ও দ্বিতীয়টি

ছিল Photoelectric Effect । Brownian motion উপর তৃতীয়টি ছিল On the Electrodynamics of Moving Bodies- শিরোনামে যা পরে বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

বিজ্ঞান লেখক বিল ব্রাইসন কৌতুক করে বলেন– আইনস্টাইনের প্রথম প্রবন্ধটি লেখা আলোর প্রকৃতি নিয়ে। এই কাজের জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার পান ১৯২১ সালে। দ্বিতীয় প্রবন্ধটি প্রমাণ করে পরমাণুর সত্যিই অস্তিত্ব রয়েছে। তৃতীয়টি আমাদের জগতকে সম্পূর্ণ বদলে দেয়। এটি ছিল আইনস্টাইনের স্থান ও কাল নিয়ে লেখা একটি যুগান্তকারী প্রবন্ধ এবং পরবর্তীতে এর নাম হয় আপেক্ষিক তত্ত্ব। নামকরণটি আইনস্টাইন প্রথমে পছন্দ করেন নি। তিনি এর নাম দিতে চেয়েছিলেন চরম অবস্থার তত্ত্ব বা অন্য কোনো নাম। কিন্তু *চলমান বস্তুর বিদ্যুৎ গতিবিদ্যা* নামে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল এবং এটিকেই মানব সমাজের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ও যুগান্তাকরী ধারণা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই প্রবন্ধটিতে কোনো ফুট-নোট ছিল না এবং গণিতও একেবারে নেই বললেই চলে। অন্য কোনো পুস্তকেরও রেফারেন্স ছিল না। সি. পি. স্নো. বলেন, 'এটি এমনভাবে তৈরি হয়েছে যে, আইনস্টাইন শুধুমাত্র নিজের চিন্তা দিয়েই প্রবন্ধটির উপসংহার টেনেছেন এবং এই জন্য তিনি অন্য কোনো পুস্তক বা মনীষীর মতামত গ্রহণ করেননি।'

অনেকে বলেন, আপেক্ষিকতত্ত্ব মানে হল সবকিছু আপেক্ষিক এই কথা বলা। আসলে এই কথাটা খুবই অর্থহীন। কারণ সবই যদি আপেক্ষিক হত তাহলে আপেক্ষিক সম্পর্ক স্থাপন করার মতো কিছু থাকতো না। বিখ্যাত দার্শনিক ও গণিতবিদ বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেছেন 'মেটাফিজিক্যাল অ্যাবসারডিটির ভিতর না গিয়েও একথা বলা যায় 'ভৌত জগতের সবকিছুই একজন পর্যবেক্ষক সাপেক্ষে আপেক্ষিক' এ দৃষ্টিভঙ্গি সত্যমিথ্যা যাই হোক না কেন আপেক্ষিকতত্ত্ব কিন্তু এ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহন করেনি। নামটার হয়তো ভাগ্য খারাপ। এ নাম দার্শনিক ও অশিক্ষিত লোকদের গোলমালে ফেলেছে। তারা ধারণা করেছেন আইনস্টাইনের এই তত্ত্ব বুঝি প্রমাণ করেছে ভৌতজগতের সবকিছুই আপেক্ষিক। অথচ এ-তত্ত্বের একমাত্র চেষ্টা 'যা কিছু আপেক্ষিক তাঁকে বাদ দিয়ে এমন একটি অবস্থানে বা বিবৃতিতে বা মাপকাঠিতে পৌছানো যে বিবৃতি বা মাপকাঠি কোনক্রমেই পর্যবেক্ষক বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করবে না'। এভাবে বলা যায় আপেক্ষিকতত্ত্ব আবিষ্কারের আগে একজন পর্যবেক্ষক যা দেখতো বলে ধারণা করা হয়েছিল এই তত্ত্ব আবিস্কারের পরে বোঝা গেল সে-পরিমাণ আসলে আরো কম।

সময়ের ব্যাপারে আপেক্ষিকতত্ত্ব কী বলে

১৯১৬ সালে সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্ব প্রকাশের মাধ্যমে মহাকর্ষকে স্থান-কালের বক্রতা হিসেবে দেখান। এরফলে আমরা জানতে পারলাম মহাকর্ষ আলোর গতিকে বাঁকিয়ে দেয়, সময়ের প্রবাহকে শ্লথ করে দেয়। অর্থাৎ D"P শক্তিসম্পন্ন মহাকর্ষক্ষেত্রে সময় আস্তে প্রবাহিত হয় স্বল্প ক্ষমতাসম্পন্ন মহাকর্ষক্ষেত্র থেকে। এই আস্তে চলা সকল প্রকার ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক প্রক্রিয়ার জন্য প্রযোজ্য। সেইজন্য এমপায়ার স্টেট বিল্ডিং এর প্রথম তলায় যে মহিলা টাইপিষ্ট কাজ করছে তার বয়স বৃদ্ধি ঐ বিল্ডিং এর সর্বো"P তলায় কর্মরত তার জমজ বোনের চেয়ে কম হচ্ছে। অবশ্য তারতম্যের পরিমাণ অত্যন্ত অল্প, দশ বছরে এক সেকেন্ডের কয়েক লক্ষ ভাগের একভাগ কম। সূর্য ও পৃথিবীপৃষ্ঠের মাঝে মহাকর্ষ পার্থক্য অধিক হওয়ার কারণে সময়ের পার্থক্য আরও বেশি হবে। সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বানুসারে আমরা যদি নীতিগতভাবে 1g ত্বরণে কোনো মহাকাশযানের গতি বাড়তে থাকলে মহাকাশযানের আলোর খুবই কাছাকাছি গতিবেগে আসতে এক বছর সময় লাগবে [$(0.01km/sec^2)$ 310^7sec) = 310km/sec]. 1g ত্বরণ হলো পৃথিবীর মাধ্যকর্ষণ। পৃথিবীতে কোনো গাছ বা উচু জায়গা থেকে নিচে পড়লে প্রতি সেকেন্ডে ৯৮০ সেন্টিমিটার বেগে আমরা মাটির দিকে অগ্রসর হই। মনে করি 1g ত্বরণসম্পন্ন ওই ধরনের একটি স্টারশিপ যে ক্রমাগতভাবে আলোর গতির কাছাকাছি আসতে থাকবে ভ্রমণের অর্ধেকটা আসা পর্যন্ত। এরপর বাকী অর্ধেক পথ মন্দন হতে থাকবে অর্থাৎ গন্তব্যে পৌছানো পর্যন্ত। ভ্রমণের বেশিরভাগ সময় মহাকাশযানের বেগ আলোর গতির কাছাকাছি থাকার ফলে সময়ের গতি শ্লথ হয়ে যাবে ভীষণভাবে। এই মিশনের কাছের গন্তব্য প্রায় ছয় আলোকবর্ষ দূরের বার্নাড নক্ষত্র হলে মহাকাশযানের ঘড়ির সময়ে এই নক্ষত্রের কোনো গ্রহে (যদি থাকে) যেতে সময় লাগবে ৮ বছর; মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্রে যেতে সময় লাগবে ২১ বছর; M_{-31} অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সিতে যেতে সময় লাগবে ২৮ বছর। অবশ্যই যে পৃথিবীতে থাকবে তার ঘড়িতে সে ভিন্নভাবে দেখবে: সে দেখবে মহাকাশযানের ৩০ হাজার বছর সময় লেগেছে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্রে পৌছাতে। এসব ভ্রমণ শেষ

আইনস্টাইনের অন্তিম স্বপ্ন

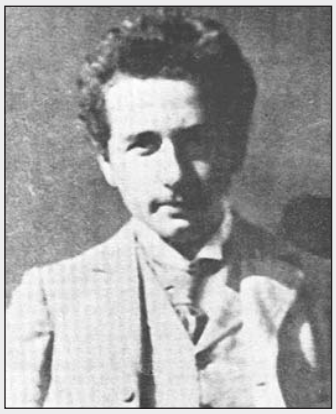

গত শতাব্দীর শেষের দিকে জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় বিজ্ঞানের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় ক্ষেত্রের ধারণাকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতত্ত্ব। আর সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্ব গড়ে উঠেছিল বিশেষ আপেক্ষিকতত্ত্ব ও সমতুল্যতার নীতির উপর ভিত্তি করে। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও আইনস্টাইন ও তার অনুসারীরা মহাকর্ষের সাথে ম্যাক্সওয়েলের বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় বিজ্ঞানের একটি সম্পর্ক স্থাপনে ব্যার্থ হয়েছেন। বিশেষ আপেক্ষিকতত্ত্বে আইনস্টাইন স্থান ও কালকে একীভূত করেছিলেন। এরপর সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্বে 'মহাকর্ষকে' একীভূত স্থান-কালের জ্যামিতিক বক্রতায় প্রকাশ করার পর আইনস্টাইনের এই বিশ্বাস জন্মেছিল যে ম্যাক্সওয়েলের বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তত্ত্ব স্থান-কালের অন্য কোনো জ্যামিতিক গুণের বহিঃপ্রকাশ। তার এই ধারণা থেকে একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বের (**Unified Field Theory**) জন্ম হয়। কিন্তু তিনি সাফল্যজনক কিছু দিয়ে যেতে ব্যার্থ হন। এই ক্ষেত্র তত্ত্বের সন্ধান আজও পাওয়া যায়নি। এর কারণ হয়তো মৌলিক কণা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের অভাব এবং মৌলিক বলগুলো সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা ছিল না। বর্তমানে আমরা জানি আমাদের মহাবিশ্বের যত ঘটনা আছে বা ঘটছে তার নেপথ্যে কারণ হচ্ছে ৪টি বল বা মিথস্ক্রিয়া। মহাকর্ষ, বিদ্যুৎ-চুম্বক, দূর্বল নিউক্লিয়ার ও শক্তিশালী নিউক্লিয়ার মিথস্ক্রিয়া। এগুলোকে একীভূত করার চেষ্টা চলছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে অগ্রগতিও ঘটেছে। নিউটন আজ থেকে ৩০৭ বছর আগে গ্যালিলিওর ধারণাগুলোর সংখ্যাভিত্তিক প্রমাণ দিয়েছিলেন বিশ্বব্যাপি মহাকর্ষসূত্র আবিষ্কার করে। মহাকর্ষের আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও আপেলের মাটিতে পতন আর পৃথিবীর চারিদিকে চাঁদের ঘূর্ণন অথবা সূর্যের চারিদিকে গ্রহগুলোর ঘূর্ণনের এই পার্থক্য হলো প্রয়োজনীয় গতির কারণে। যারফলে গ্রহগুলো সূর্যের দিকে পতনশীল থাকা সত্ত্বেও কখনও সূর্যকে স্পর্শ করতে পারে না। এভাবেই শুরু হলো আমাদের প্রকৃতির সমস্ত ঘটনাবলীকে একদৃষ্টিতে দেখার সফল যাত্রা। নিউটনের প্রায় ১৫০ বছর পরে ফরাসী পদার্থবিজ্ঞানী আন্দ্রেমারী অ্যাম্পিয়ার (১৭৭৫--১৮৩৬) ও ইংরেজ পদার্থবিজ্ঞানী মাইকেল ফ্যারাডে প্রমাণ করেছিলেন যে গতিশীল আধান দিয়ে তৈরি হয় চৌম্বক শক্তি। অর্থাৎ বিদ্যুৎ ও চুম্বক বলের মধ্যে আপাত পার্থক্য নির্ভর করে এই বল উৎপাদনকারী বৈদ্যুতিক আধানগুলোর গতিহীন অথবা গতিশীল কিনা তার উপর। অবশেষে ম্যাক্সওয়েল ১৮৬৪ সালে দেখালেন যে বিদ্যুৎ ও চুম্বক বল আসলে একই সত্ত্বার দ্বৈত প্রকাশ। ত্বরণসম্পন্ন বৈদ্যুতিক

করে যখন আমরা বাড়ীতে ফিরতাম তখন আমাদের জন্য আর কোনো বন্ধুই থাকতো না সম্ভাষণ জানানোর জন্য। নীতিগতভাবে আলোর গতির কাছাকাছি (দশমিক পার্থক্যে) বেগে চলে মহাকাশযানের সময়ে ৫৬ বছর লাগবে পরিচিত বিশ্ব ভ্রমণ করতে। ভ্রমণ শেষে আমরা ফিরে আসতাম এক হাজার কোটি বছর দূর ভবিষ্যতের পুড়ে অঙ্গার হয়ে যাওয়া পৃথিবীতে এবং তার মৃত সূর্যকে দেখতে। আপেক্ষিকতা-ভিত্তিক মহাকাশভ্রমণ অপরিমেয় মহাবিশ্বকে গ্রহণযোগ্য করে তোলে উন্নত সভ্যতার কাছে, কিন্তু শুধুমাত্র তাদের কাছে যারা ভ্রমণে যাবে। এমন কোনো পথ নেই যাতে রেখে আসা পৃথিবীতে আলোর গতি থেকে "ত তথ্য পাঠানো যেতে পারে, আর যে যাবে সে নিজেও সেই পরিচিত পৃথিবী, ভাইবোন, এবং প্রিয়জনদের কাছে কখনো ফিরে আসবে না। তারা সবাই কালের অন্তরালে হারিয়ে গেছে।

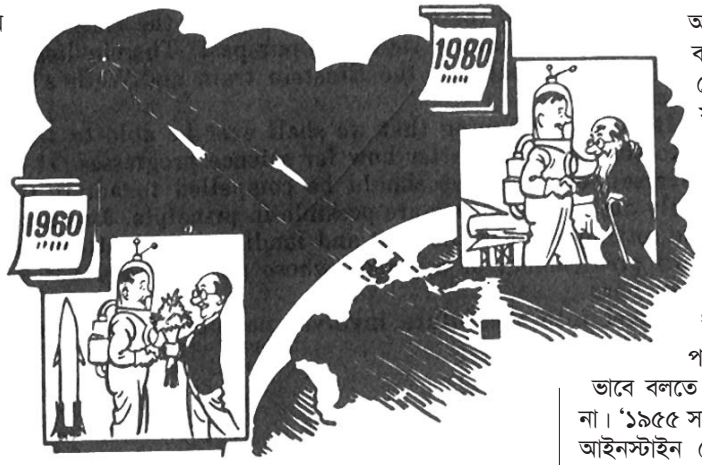

টুইন প্যারাডক্স : যমজ দুই ভাইয়ের একজন মহাকাশযানে করে আলোর গতিতে মহাকাশে ঘুরে এসে দেখবে পৃথিবীতে ২০ বছর পার হয়ে গিয়েছে। অথচ তার বয়স খুব একটা বাড়ে নি

আধান দ্বারা সৃষ্ট বিকিরণের মাধ্যমে এই বিদ্যুৎ-চুম্বক বলের একত্রিকরণের প্রকাশ ঘটে যেমন দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান আলো, X-ray ইত্যাদি।

১৯০৫ সালে আইনস্টাইন স্থান ও কালের ধারণাকে একত্রীত করেছিলেন তার বিশেষ আপেক্ষিকতত্ত্বের মাধ্যমে। ১৯১৬ সালে সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্বের মাধ্যমে তার একত্রীকরনের ধারণা আরও সাধারনীকরনের/সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেখালেন যে নিউটনের মহাকর্ষ আসলে স্থান-কালের বক্রতার/বহুধার একটি বহিঃপ্রকাশ। সবশেষে তার কাজের পরিণতি হিসেবে দেখাতে চেয়েছিলেন মহাকর্ষ ও বিদ্যুৎ-চৌম্বক বল একটি মাত্র বলের বিভিন্ন রূপ। তিনি আরও আশা প্রকাশ করেছিলেন ভরকে --মহাকর্ষ আধান-- স্থান-কালের বক্রতার সঙ্গে জড়িত করার মতো বৈদ্যুতিক আধান একইভাবে স্থান-কালের কাঠামোর অন্যকোনো জ্যামিতিকগুণের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকবে।

১৯৬৭ সালে লন্ডনের ইম্পেরিয়াল কলেজের আব্দুস সালাম, হারভার্ডের ওয়াইনবার্গ প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় ও দূর্বল নিউক্লিয়ার মিথস্ক্রিয়াকে একীভূত করার কতগুলো তত্ত্ব বিকশিত করেন। তত্ত্বটি গঠনের পথে মূল সমস্যা ছিল দূর্বল নিউক্লিয়ার বল বহনকারী কণাসমূহের ($W^{\pm}$, Z°) আছে নির্দিষ্ট ভর অথচ বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় বল বহনকারী কণা ফোটনের কোনো ভর নেই। সালাম, ওয়াইনবার্গ তাদের তত্ত্বের মাধ্যমে যা দেখিয়েছিলেন তাহলো একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে উভয় বলগুলো একটি একক মিথস্ক্রিয়ার ফলাফল যা ৪টি ভরহীন বোসন কণার মধ্যদিয়ে বাহিত হয়। এই নির্দিষ্ট অবস্থা ১০০গি.ই ভোল্ট বা তার চাইতে বেশি। স্বতস্ফূর্ত প্রতিসাম্য ভঙ্গনের মধ্যেদিয়ে বোসন কণিকারা তিনটি ভরসম্পন্ন $W^{\pm}$, Z° কণিকায় রূপান্তরিত হয়। ফলাফলস্বরূপ দূর্বল নিউক্লিয়ার বল অল্পজায়গার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। চতুর্থ ভরহীন বোসন কণা ফোটনভরহীন কণাই থেকে যায়। এরফলেই বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় বলের বিস্তার হয়ে দাড়ায় অসীম। ১৯৭৯ সালে সালাম, ওয়াইনবার্গ ও তাদের সাথে অনুরূপ কাজের জন্য শেল্ডন গ্ল্যাশো নোবেল পুরুস্কার পান। ১৯৮৩ সালে CERN (European centre for nuclear reasearch)-এ ফোটনের তিনটি ভরযুক্ত অংশীদার আবিষ্কৃত হয়।

এই একত্রিকরণের পরে বিদ্যুৎ-দূর্বল (Electroweak) নিউক্লিয়ার বলের সংগে শক্তিশালী নিউক্লিয়ার বলের সমন্বয় করার জন্য অনেকগুলো প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে যাকে আমরা বলি Grand Unified Theory| এই তত্ত্ব এমন একটি মিথস্ক্রিয়ার কথা বলে যার ফলে প্রোটন গড়ে $১০^{৩০}$ বছর পরে ক্ষয় হয়ে লেপ্টনে পরিণত হয়। অথচ আমাদের বিশ্বের বয়স $১০^{১০}$ এর বেশি হবে না। এই ধরনের পরীক্ষা চালানোর জন্য ১০০০ মিলিয়ন গিগা.ই ভোল্ট সম্পন্ন কণিকা উৎপাদন করতে হবে। বর্তমান প্রযুক্তির প্রেক্ষাপটে এই ধরনের যন্ত্রের আয়তন হবে সৌরজগতের সমান। বর্তমানে মাত্র ১০০গিগা ই.ভোল্ট সম্পন্ন কণার সংঘর্ষ ঘটানো সম্ভব।

কিন্তু মহাকর্ষ বল বাকী বলগুলোর সাথে একীভূত হবে কি? এগুলোকে একটি মাত্র মিথস্ক্রিয়ার ফলাফল হিসাবে প্রকাশ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। যদি তা সফল হয় তাহলে এই একীভূত বলকে স্থান-কালের কোনো জ্যামিতিকগুণে প্রকাশ করার চেষ্টা আইনস্টাইনের স্বপ্নকে সফল করার দিকে নিয়ে যাবে। অনেক ধরনের পথ নির্দেশনা আসছে তবে কাজটি খুব সোজা নয়। হয়তো এরজন্য দীর্ঘসময় অপেক্ষা করতে হবে?

আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব বলে সময়ের গতিকে শ্লথ করে দেওয়া সম্ভব, দূর ভবিষ্যতেও যাওয়া সম্ভব কিন্তু সেখান হতে কোনক্রমে ফিরে আসা সম্ভব নয়।

প্রফেসর আব্দুস সালাম বলেছিলেন, 'এ শতাব্দীতে আইনস্টাইনের মতো কোনো মানুষ জন্মগ্রহণ করেনি--সম্ভবত মানুষ্যজাতির সমগ্র চিন্তার ইতিহাসেও নয়; অন্তত পদার্থবিজ্ঞানের ব্যাপারে নিশ্চিত-ভাবে বলতে পারি এরকম আর কেউ ছিলেন না। '১৯৫৫ সালের ১৮ই এপ্রিল মাত্র ৭৬ বছরে আইনস্টাইন শেষঃনিশ্বাস ত্যাগ করেন। তার মৃত্যুর পর প্রখ্যাত কার্টুনিস্ট হারব্লকের ছবি একে পৃথিবীর উপরে লিখে দেন Albert Einstein lived here.'| যেন মনে হয়, যদি কোন দিন আন্তঃনাক্ষত্রিক সভ্যতার কোনো মহাকাশযান এই সৌরজগতের পাশ দিয়ে যায় তাহলে বলবে, 'ঐ হল পৃথিবী যেখানে আইনস্টাইনের মতো অসাধারণ প্রতিভার জন্ম হয়েছিল যিনি চতুর্মাত্রিক ধারণার উদ্ভব ঘটিয়েছিলেন।'

২০০৫ সালকে জাতিসংঘ বিশ্ব পদার্থবিজ্ঞান বছর হিসেবে ঘোষণা করেছে। জার্মান সরকারও আইনস্টাইন বছর ঘোষণা দিয়েছে। এ উপলক্ষ্যে জার্মানীর বার্লিন প্রশাসন পোসডাম শহরের কাপুথ গ্রামে আইনস্টাইনের খামার বাড়িটি আগামী এক বছরের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বর্তমানে পর্যটকেরা আইনস্টাইনের শোবার ঘর, বাথটাব থেকে শুরু করে যে টেবিলে বসে বিখ্যাত আপেক্ষিকতার সূত্রগুলো লেখা হয়েছে সেগুলোর সবই দেখতে পাবেন। ধারণা করা হয় ১৯২৯ সাল থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত আইনস্টাইন কাপুথে ছিলেন। ঘন জঙ্গলে ঢাকা ছিমছাম নিরিবিলি বাড়ীটিতে আইনস্টাইন তার স্ত্রী এলাসহ দুই কন্যা মার্গট ও লিজাকে নিয়ে থাকতেন। এই বাড়িতে দেখা করতে এসেছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ বিশ্ববরেণ্য ব্যাক্তিত্বরা। তাদের সঙ্গে আলোচনা, তর্কের পাশাপাশি রাতভর চলতো মহাবিশ্ব নিয়ে জ্ঞানের বিশ্লেষণ। আইনস্টাইন শুধু পদার্থবিজ্ঞানেই অবদান রাখেন নি। তার সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গিই তিনি বিজ্ঞানকে দিয়েছেন।

তথ্যপঞ্জী ও কৃতজ্ঞতা: *কসমস, **Special theory of Relativity by V.A.Ugarov, Mir Publishers Moscow**. Abdus Salam's Ideals and Realities বাংলানুবাদ: আদর্শ ও বাস্তবতা, অনুবাদ: এ.এম.হারুন অর রশীদ: Concept of modern physics by Arthour Beiser Fourth Edition 1987; বাংলা একাডেমী বিজ্ঞান পত্রিকা, ষষ্ঠ বর্ষ: ২য় -- ৩য় সংখ্যা আইনস্টাইন জন্মশতবর্ষ সংখ্যা; জানুয়ারী ১৯৮১; ডিসকাশন প্রজেক্ট গ্রন্থাগার; জার্মান থেকে প্রকাশিত ডয়েসল্যান্ড ডিসেম্বর ২০০৪-জানুয়ারি ২০০৫; সময়ের প্রহেলিকা।*